দ্যা থিউরি অব চেঞ্জ

ড. এম. শাহেদুল ইসলাম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

নো ওয়ার্ক নো ফুড	৯
নো আনইমপ্লয়মেন্ট বি ডেলিজেন্ট	১৪
নো করাপশন বি অনেস্ট	২৮
নো ইন্টারেস্ট ডু বিজনেস	৩৪
নো ওয়েস্টার্ন কালচার বি সোশ্যাল	৫২
নো রিলিজিয়াস এডুকেশন নো এডুকেশন	৬০
নো হিজাব নো আউট	৭২
নো ম্যারেজ নো সেক্স	৮৭
নো ড্রাগস বি হেলদি	৯৭
নো ওয়েস্ট টাইম বি পাঙ্কচুয়াল	১০৯
নো রুরাল ডেভেলপমেন্ট নো ডেভেলপমেন্ট	১১৩
নো স্মার্ট সিটি নো সিটি	১১৯
নো ফিউরিয়াস বি ডিসিপ্লিন্ড	১২৬
নো ভায়োলেন্স বি পিস্ড	১৩১

নো ওয়ার্ক নো ফুড

নো ওয়ার্ক নো ফুড একটি সহজ, সাবলীল ও পুরোনো কথা; কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সৌন্দর্য ও কল্যাণের আধার। যদি এ কথাটি অনুধাবনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সমগ্র বিশ্বলোকে নীরব অথচ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত করা সম্ভব।

এই ছোটো একটি বাক্য পরিবর্তন করে দিতে পারে আপনার জীবন, পরিবেশ তথা গোটা পৃথিবীকে। কিন্তু কীভাবে এই বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব? এর উত্তর ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই তার প্রতিটি মুহূর্ত এবং কাজ হবে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে। ঘুম থেকে উঠেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি রিজিকের সন্ধানে। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ৬০ শতাংশ মানুষ ন্যূনতম কোনো কাজ না করেই সকালের নাশতা গ্রহণ করে। কোনো কাজ না করা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, সামান্য শারীরিক পরিশ্রম।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কায়িক পরিশ্রমের বিকল্প নেই। মানুষ ঘুম থেকে উঠে যার যার ধর্মমতে ইবাদত করে, কেউ সামান্য ব্যায়াম করে, কেউবা আবার ঘুমের মধ্যেই পুরো সকালটা কাটিয়ে দেয়। প্রকৃত ইবাদতকারীর সংখ্যা গণনা করলে এর পরিসংখ্যান শতাংশে দুই থেকে তিনজনের বেশি হবে না। আর শরীরচর্চাকারীর সংখ্যা হিসাব করলেও বড়োজোর তা দুই থেকে তিনজনই হবে।

অর্থাৎ ৯৫% মানুষ অলসতায় নিমজ্জিত। অথচ তারা যদি ব্যক্তিগত ছোটোখাটো কাজ নিজেরাই করে, তাহলে মানসিকতা তো চাঙা থাকবেই, পাশাপাশি এই কৌশল মানুষকে ধীরে ধীরে আদর্শবান মানুষে পরিণত করবে। এজন্য ব্যক্তিজীবনে সুখী হতে হলে, আপনাকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কিছু না কিছু কাজ অবশ্যই করতে হবে এবং হতে হবে স্বনির্ভর। প্রতিদিনের ছোটোখাটো কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- নিজের বিছানা গোছানো
- নিজেকে পরিপাটি রাখা ও কাপড়চোপড় ধোয়া
- রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা অথবা বাগানে পানি দেওয়া

- বাড়ির আশেপাশে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার
- নিজের বাথরুম নিজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং
- সাধ্যমতো শরীরচর্চা করা ইত্যাদি।

বলছি না, এই কাজগুলো আপনাকেই প্রতিদিন করতে হবে। আমি বলতে চাই, সকালের নাশতা গ্রহণের পূর্বে ওপরের তালিকা থেকে সাধ্যমতো কিছু একটা করুন। ইচ্ছা হলে তালিকার বাইরে অন্য কিছুও করতে পারেন। কিন্তু কোনোভাবেই খাবারের আশপাশে ভিড়বেন না, যতক্ষণ না কোনো কাজ করছেন। এভাবে পরিকল্পনামাফিক জীবন পরিচালনা করলে শিশু ও কিশোররাও আপনার কাছ থেকে শিক্ষা নেবে। বাসায় করার মতো যদি কোনো কাজ না থাকে, তাহলে স্বেচ্ছাসেবী হোন। আশেপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখুন। যারা শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারছে না, তাদের সাহায্যে এগিয়ে যান। রোগীর সেবা ও প্রতিবেশীকে সাহায্য করুন।

অন্যের কাজ করার ক্ষেত্রে দুটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। **প্রথমত,** পারিশ্রমিক নিয়ে। **দ্বিতীয়ত,** স্বেচ্ছাশ্রমে।

কথায় আছে, বেকার থাকার চেয়ে বেকার খাটা অনেক ভালো। সত্যিই যদি কাজের প্রতি মনোযোগী হন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি একজন স্বাস্থ্যবান ও সুখী মানুষ। আপনার কর্মতৎপরতা আপনাকে মহান করে তুলবে। উপকৃত হবে পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র। যদিও এই ক্ষেত্রে আপনার কাজ অতি সামান্য।

অনেকেই বলবেন, আমি তো চাকরিজীবী। তাহলে এসব ছোটোখাটো কাজ করতে যাব কেন? এটা খুবই ভালো, আপনি বেকার নন। কিন্তু যদি দেখেন আপনার অফিসে শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ নেই, তাহলে ছোটোখাটো কাজের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। তাতে অহংকার কমবে, মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক উন্নতি হবে।

আপনার পরিকল্পনায় নিজের এলাকাকে বেছে নিন। জনসচেতনতা এবং সেবামূলক কাজ করুন। দেখবেন, আশেপাশের পরিবেশটা অনেক সুন্দর ও মনোরম হয়ে উঠেছে। এখানে প্রতিটি কাজই ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করা প্রয়োজন। কাজকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আপনার সুবিধামতো করুন। তবে মনে রাখতে হবে, কাজ না করে কোনো খাবার গ্রহণ নয়। সকালের নাশতা, দুপুর ও রাতের খাবার গ্রহণের পূর্বে কিছু একটা অন্তত করে নিন। এজন্য নিচের কাজগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

সকালের কাজসমূহ

- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা অজু করা

- বিছানা গোছানো
- ব্যায়াম করা
- ইবাদত কিংবা মেডিটেশন করা
- রান্নাবান্নার কাজ করা এবং
- ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি।

দুপুরের কাজসমূহ

- ব্যক্তিগত কাজ, চাকরি-বাকরি
- ব্যাবসা-বাণিজ্য, জনসেবামূলক কাজ
- প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখা
- ঝোপঝাড় (গ্রামে হলে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা
- রাস্তাঘাট মেরামত করা এবং
- গরিবদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

বিকালের কাজসমূহ

- নিজের বাসাবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা
- বাগানে পানি দেওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা,
- গাড়ি (যদি থাকে) পরিষ্কার করা এবং
- বাসার কাজ না থাকলে বন্ধু কিংবা প্রতিবেশীর বাসায় গিয়ে কাজ করা।

আপনি এসব নিজের ইচ্ছামতো করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, দৈনন্দিন করার মতো কিছু কাজ থাকা চাই। এভাবেই আমরা আমাদের চিন্তা ও মানসিকতাকে কাজের মাধ্যমে পরিবর্তন করে গোটা সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারি।

উপরিউক্ত তালিকা অনুযায়ী যদি কাজ করতে না পারেন, তাহলে অন্তত এক মগ পানি গাছের গোড়ায় দিয়ে এসে খাবার গ্রহণ করবেন। এই সামান্য কাজটুকু আপনাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করবে। ধরা যাক, ১৬ কোটি মানুষ একটি করে গাছ লাগাল এবং নিয়মিত পানি দিলো। আমরা অনেকেই ভাবতে পারি, কী হবে তাতে? মূলত এতে সহায়ক হলো—গাছগুলো সতেজ হওয়ার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে সাহায্য করা। আর সকলে গ্রহণ করতে পারল মুক্ত ও পিওর অক্সিজেন।

যদি বাগান না থাকে, তাহলে অন্তত বাসায় দু-চারটি টব রাখতে পারেন। সুযোগ থাকলে ছাদ কৃষি করতে পারেন। তাতে আপনার সৌখিনতাও প্রকাশ পাবে। রক্ষা হবে পরিবেশের ভারসাম্য। পূরণ হবে শাকসবজি আর ফলের চাহিদা। তা ছাড়া এর দ্বারা তৈরি হবে শারীরিক পরিশ্রম করার মানসিকতা। এটা আমাদের পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যদি শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছু না করি, তাহলে পরিবর্তন আদৌও সম্ভব নয়। আর তা শুরু করতে হবে আমার নিজ থেকেই। এই পরিবর্তনের কাজটা যখন নিজ থেকে শুরু করব, তখন আমার দেখাদেখি পরিবারে ও সমাজে পরিবর্তন আসবে। সেইসাথে পরিবর্তন আসবে পুরো দেশেই। এ ছাড়াও ছোটো ছোটো পরিবর্তনগুলো একদিন পুরো জাতির বড়ো পরিবর্তন সহায়ক হবে।

সবাই শুধু মোটিভেশনাল বয়ান দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিলগেটস, ওয়ারেন্ট বাফেট, কেএফসির প্রতিষ্ঠাতা, মুকেশ আম্বানি, আলিবাবার কর্ণধার জ্যাক মা, ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা জুকারবার্গ ও স্টিভ জবসের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের জানা উচিত, সবাই বিলগেটস কিংবা ওয়ারেন্ট বাফেট হতে পারবে না। কেননা, সবার আইকিউ, চিন্তাশক্তি এবং রুচিবোধ ভিন্ন ভিন্ন।

এজন্যই মূলত একই সূত্র, একই গল্প অন্যের সফলতার জন্য প্রযোজ্য নয়। মানুষের চেহারা, গায়ের রং, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পছন্দ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, ঠিক তাদের সফলতার মাপকাঠিও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ কম্পিউটার আবিষ্কার করে সেরা ধনী হয়েছে। আবার কেউ শেয়ার বাজার কিংবা মুরগি সাপ্লাই করে; এমনকি কেউ কেউ সবজি ব্যাবসা করেও সফল হয়েছে। কাজেই সফলতার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। এটা নির্ভর করে ব্যক্তির চিন্তা, পরিশ্রম ও দক্ষতার ওপর।

কৃতিত্বটাই আসলে সুখ নয়। আবার দেখা যায়—এমন অনেক মানুষ আছেন—বহু টাকার মালিক; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই অসুখী। তিনি কিন্তু আমার বিবেচনায় সফল নন। আবার এমন মানুষও আছেন, যিনি সাধারণ জীবনযাপন করে নিজেকে সফল ব্যক্তি মনে করেন। অনেকে মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই মানুষকে যোগ্য করে তোলে। আমি বলি—না।

বিশ্বের বহু সফল ব্যক্তি আছেন, যারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। কোনো প্রতিষ্ঠানেও যাননি। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রয়েল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ এসব ইউনিভার্সিটিতে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, নিউটন কিংবা ইবনে সিনার মতো জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা বই পাঠ্য; যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরে থাক, গতানুগতিক স্কুলেও পড়েননি।

এবার আসুন, জেনে নিই—কীভাবে স্বপ্ন পূরণ করা যায়। বাস্তব জীবনে প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারলেই তার জীবন ৮০ ভাগ সফল। আর ২০ ভাগ তার নিয়মশৃঙ্খলা। পাশাপাশি রাষ্ট্র, সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান তাকে সাহায্য করতে পারে। মানুষের মৌলিক

চাহিদাগুলোর মধ্যে যেমন : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সবকিছুতেই রাষ্ট্র যারা সমাজ পরিচালনা করে, তাদের সাথে সম্পর্কিত এবং তারাই দায়ী।

যদি এই পাঁচটি জিনিসকে ভালোভাবে আমরা সাপোর্ট করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন অনেক সুন্দর আর সুখময় হবে। গতানুগতিক নিয়ম ফলো করলেই কেবল সফলতা আসবে না। এটা এখন সময়ের দাবি। আশা করি, ব্যক্তিপর্যায়ে কাজের বাস্তবায়নের জন্য এই নিয়মগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসবে, যা কি না সহায়ক হবে সুখী ও সমৃদ্ধশালী একটি রাষ্ট্র গঠনে।

নো আনইমপ্লয়মেন্ট বি ডেলিজেন্ট

বেকারত্ব এক বিরাট সমস্যা। শুধু বাংলাদেশেই নয়; সারা বিশ্বে এটি একটি অভিশাপ। যাকে আমরা ক্রাইসিস বলতে পারি। এটা যদি মহামারি আকারও ধারণ করে, তা বুদ্ধিমত্তা ও গবেষণামূলক উদ্ভাবনী থিওরির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারক। যাদের সঠিক পরিকল্পনা, সিস্টেমের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে, বেকারত্বের সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হওয়া সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৫২ লাখ। তন্মোধ্যে ৫০.৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯.৪ শতাংশ নারী। মোট জনসংখ্যা তিনটি স্তরে ভাগ করলে দাঁড়ায় : ১ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ৩৪.৩ শতাংশ, ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে ৬১.৭ শতাংশ, ৬৫ বছরের ওপরে ৪.৭ শতাংশ। নির্ভরশীলদের অনুপাত যা 'ডিপেন্ডেন্সি রেশিও' নামে পরিচিত তা ৪৮.৯৫ শতাংশ, তার মধ্যে শিশু ৪১.৩৫ এবং বয়স্ক ৬৫ বছরের ওপরে ৭.৬ শতাংশ। সর্বমোট চাকরিজীবী ৬২.৩ এবং বেকার ৩৭.৭ শতাংশ। সর্বমোট ৩৭.৭ শতাংশ বেকার হলেও বাস্তবে এর সংখ্যা অনেক বেশি।

সুতরাং কীভাবে এই বিশালসংখ্যক বেকারের চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, সে ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের সিস্টেমের উন্নয়ন করতে হবে। যদিও এখানে ৬৫ বছরের ওপরে সমীক্ষা করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে ৬০ বছরের বেশির ভাগ লোকই নিষ্ক্রিয় বা কর্মহীন। সে অনুযায়ী বয়স্কদের ৭.৬ শতাংশের বেশি পরনির্ভরশীল। তা কমপক্ষে দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ হবে।

গড়ে যদি ১৫.৫ শতাংশ হিসাব করা হয়, তাহলে নির্ভরশীলদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৬.৫৫ শতাংশ। আর কর্মঠ লোকের সংখ্যা ৪৩.৪৫ শতাংশ। কোনো কাজ না করে বাড়িতেই শুয়েবসে সময় কাটছে অনেকের। কিন্তু সরকারি জরিপের তথ্যে এদের নাম বেকারের খাতায় উঠছে না। দেশে শুয়েবসে সময় কাটানোসহ প্রকৃত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার। তন্মোধ্যে কর্মক্ষম কিন্তু শ্রমশক্তিতে যোগ হয়নি—এমন মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৫৬ লাখ। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুযায়ী, এদের বেকার বলা হচ্ছে না। কেবল বাংলাদেশে সরকারি জরিপ অনুযায়ী সারা দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। এসব বেকারদের মধ্যে ১০ লাখ ৪৩ হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণী, যাদের কিনা উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। অর্ধ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৪০ শতাংশ।

বিবিএসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মোট কর্মোপযোগী মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৯১ লাখ। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৮ লাখ মানুষ। বাকি ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ কর্মক্ষম, তবে শ্রমশক্তির বাইরে। এতে আবার শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারী-পুরুষও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আইএলও-এর সংজ্ঞার মধ্যে না পড়লেও বাংলাদেশে এরাই হচ্ছে প্রকৃত বেকার।

আইএলও-এর সংজ্ঞায় বেকার হচ্ছে—জরিপের সময় থেকে গত এক মাসের মধ্যে যারা কাজ খুঁজেছেন, কিন্তু পাননি। কর্মে নিয়োজিত ৬ কোটি ৮ লাখ মানুষের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে আছেন ২ কোটি ৪৭ লাখ, শিল্পে ১ কোটি ২৪ লাখ এবং সেবা খাতে যুক্ত ২ কোটি ৩৭ লাখ মানুষ। কর্মক্ষম তবে শ্রমশক্তির বাইরে থাকা ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজারের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৬৩ লাখ ৩৩ হাজার এবং পুরুষ ১ কোটি ১৯ লাখ ৪৭ হাজার।

এক

দেশের রেমিট্যান্স খাত হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। সেখান থেকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়, তেমনি আমাদের দেশ থেকেও দেশীয় মুদ্রা চলে যাচ্ছে বিদেশে। সেই দিকটাও আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে বসবাস করেন প্রায় ১২ লাখ। তাদের মধ্যে অবৈধ বিদেশির সংখ্যাই ১০ লাখ। তাদের মধ্যে আয়কর দেয় মাত্র ১৬ হাজার।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ভারতীয় ৫ লাখ নাগরিকের বেশির ভাগই অবৈধ হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং এই সেক্টরটিও আমাদের খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, কলকারখানায় এই ধরনের অবৈধ বিদেশিদের অবস্থান রয়েছে। অধিকাংশ বিদেশি কাজ করেন রপ্তানিমুখী মাঝারি ও বড়ো কারখানায়। বড়ো ব্যাবসায়িক গ্রুপেও তারা কাজ করেন। সবচেয়ে বেশি বিদেশি কাজ করেন পোশাক কারখানায়। এর প্রায় অর্ধেকই প্রতিবেশী দেশগুলোর নাগরিক। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আরও কত বিদেশি অবৈধভাবে দেশে কাজ করছেন, এরও সঠিক কোনো হিসাব নেই।

ভারত, চীন, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, ঘানা, কঙ্গো, তাইওয়ান, ইরাক, আফগানিস্তান, তানজানিয়া, আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি দেশের মানুষ বাংলাদেশে কাজ করেন। টেক্সটাইল মিল, ওভেন ও নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি, সোয়েটার ফ্যাক্টরি, বায়িং হাউস, মার্চেন্ডাইজিং— এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাজ করেন বেশি অবৈধ বিদেশি। এর বাইরেও আছে খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান, ফার্নিচার কোম্পানি, পোলট্রি খাদ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন হাউস, চামড়াজাত, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর প্রায় সাড়ে চার হাজারের বেশি সদস্য রয়েছেন। তাদের পরিচালনা পর্ষদ পোশাক কারখানায় কর্মরত বিদেশিদের সংখ্যা জানতে চেয়ে সদস্যদের চিঠি দেয়। চিঠিতে বিদেশিদের নাম, পদবি, কোন বিভাগ, কাজের দক্ষতা, কতদিন ধরে কাজ করছে, জাতীয়তা ও মাসিক বেতন কত ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু বিজিএমইএ মাত্র ৫২টি পোশাক কারখানার তথ্য পেয়েছে। সেখানে অবশ্য খুব বেশি বিদেশি কর্মীর তথ্য ছিল না। এভাবেই তারা গোপনে গোপনে অবৈধভাবে হাতিয়ে নিচ্ছে আমাদের দেশীয় মুদ্রা।

এ বিষয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের দেশে এক্সপার্ট নেই। বাধ্য হয়ে অন্য দেশ থেকে এক্সপার্ট নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু কেন? আমরা কেন স্বাধীনতার ৫১ বছরেও কিছু কর্মদক্ষ লোক তৈরি করতে পারিনি? কেন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি? আমাদের সকল ইঞ্জিনিয়ার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিক্যাল হ্যান্ডগুলোকে কেন উন্নত ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ বানাতে পারিনি? আমাদের সেক্টরগুলো কেন সমৃদ্ধ করতে পারিনি? কেন আমাদের দেশের অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছে? আমি বলছি না—বাইরে থেকে কোনো এক্সপার্ট নেওয়ার দরকার নেই। একান্ত প্রয়োজনে সহযোগিতা তো নিতেই হবে। তাই বলে কি নিজেদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলব না?

বাংলাদেশের নাগরিক বিদেশি প্রবাসী প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ। তন্মোধ্যে কেউ পারমানেন্ট নাগরিকত্ব, কেউ দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে, আবার কেউ কর্মসংস্থানের সুবাদে। ২০২১-২০২২ সালে রেমিট্যান্স এসেছে ২০.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২০-২০২১ সালে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালে রেমিট্যান্স এসেছে ১৮.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গিয়েছিল প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এর পরিমাণ কমপক্ষে ৮-১০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে।

এত কষ্ট করে আমার দেশের মানুষগুলো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। আর আমার দেশ থেকে দক্ষ লোকের নাম করে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অবৈধ নাগরিকরা সমস্ত টাকা নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে। তাহলে প্রবাসীদের এত কষ্ট করে কী লাভ হচ্ছে? বিদেশিরা বাংলাদেশে কাজ করলে তাদের উচ্চপর্যায়ের বেতন দিতে হয়। তা ছাড়া নিজ দেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই রকম দক্ষ লোকবল গড়ে তুলতে পারলে কমপক্ষে ১ কোটি বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

যেভাবে বিদেশ থেকে এক্সপার্ট আনা বন্ধ করতে পারি : প্রয়োজনীয়সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে ধীরে ধীরে এক্সপার্ট হিসেবে বিভিন্ন সেক্টরে যেমন : গার্মেন্টস-টেক্সটাইল ও কলকারখানায় নিয়োগ দিতে পারি। এটা আবার অল্প সময়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা; সেখানে প্রতিবছর আমরা প্রায় ৫০ হাজার থেকে শুরু করে ১

লক্ষ লোক প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে পারি। এ কাজটা হতে পারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে।

একসময় আমরা হয়তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব। তখন বিদেশ থেকে খুব বেশি দক্ষ লোক নিয়ে আসার দরকার হবে না। এভাবেই সমৃদ্ধ করতে পারি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরগুলো। প্রযুক্তিকে নিজেরাই উন্নতি করার মাধ্যমে সমাধান করতে পারি এর নানান সমস্যা। এর ফলে দেশের টাকা দেশেই রেখে দেওয়া সম্ভব হবে। আর এভাবেই দূর হবে আমাদের বেকারত্বের করুণ সমস্যা।

দুই

উপরিউক্ত সমীক্ষা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে বেকারত্বের হার এবং তার একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য। এই সমস্যা সমাধানকল্পে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, এর ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি একটি বৃহত্তর সমস্যা। এর সমাধানের জন্য আমরা যা করতে পারি—বর্তমানে যে পদ্ধতি রয়েছে, তার আংশিক পরিবর্তন এবং নতুন পদ্ধতি চালু করা। যে সকল ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আনা যায়—

সমস্ত সরকারি বিভাগসহ বেসরকারি বিভাগগুলোর মধ্যে শিল্পকারখানা ও কৃষি খাতগুলোকেও প্রাধান্য দিতে হবে। পাশাপাশি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা পদ্ধতিগত উন্নয়ন করতে পারি। এজন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ, কোন পদ্ধতি এবং আইন প্রয়োগ করলে দ্রুত ফলাফল পাওয়া সম্ভব, এ নিয়ে গবেষণা করে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বেসরকারি বড়ো বড়ো বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন : যমুনা, বসুন্ধরা, আকিজ, প্রাণ-আরএফএল, এস আলম, পারটেক্স, আবুল খায়ের গ্রুপ ইত্যাদি। এ ছাড়াও বড়ো বড়ো আরও অনেক গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্টিজ রয়েছে। এ ধরনের কোম্পানিগুলোকে প্রথম সারিতে রেখে বাকিগুলোকে ক্যাটাগরি এ, বি ও সি-এর মধ্যে রেখে, সেখানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইচআরও (Human resource Outsourcing) ম্যানেজমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, সেলস ও মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টস, স্টোর ও ইনভেন্টরি এবং সাধারণ পোস্টে প্রয়োজন অনুযায়ী ৫-২৫ শতাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সর্বমোট শিল্পকারখানা রয়েছে প্রায় ৭৮ লাখের মতো। তন্মধ্যে ৬০ লাখ রয়েছে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ। বাকি ১৮ লাখ মোটামুটি বড়ো পর্যায়ের। সেই ক্ষেত্রে গ্রুপ অব কোম্পানি রয়েছে প্রায় ৫০০।

ক্যাটাগরি ‘এ’ প্রায় ২০০০ (দুই হাজার)

ক্যাটাগরি ‘বি’ প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার)

ক্যাটাগরি ‘সি’-তে পড়বে প্রায় ১৭ লাখ ৯৩ হাজার।

যদি সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে গ্রুপ অব কোম্পানি প্রায় ৫০০। এক একটি গ্রুপে প্রায় গড়ে ২০ হাজার কর্মচারী রয়েছে। ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করলে ২৫ লাখ কর্মচারী নতুন নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

ক্যাটাগরি 'এ'-তে পড়বে প্রায় ২০০০টি। প্রতিটি কোম্পানিতে কর্মচারী রয়েছে গড়ে ৫০০০ জন। তাহলে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করলে ২০ লাখ কর্মচারী নতুন নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

ক্যাটাগরি 'বি'-তে পড়বে প্রায় ৫০০০টি। প্রতিটি কোম্পানিতে কর্মচারী রয়েছে গড়ে ২৫০ জন। তাহলে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করলে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ কর্মচারী নতুন নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

ক্যাটাগরি 'সি'-তে পড়বে প্রায় ১৭ লাখ ৯৩ হাজার। প্রতিটি কোম্পানিতে কর্মচারী রয়েছে গড়ে ১০ জন। তাহলে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করলে ৮ লাখ ৯০ হাজার কর্মচারী নতুন নিয়োগ দেওয়া সম্ভব। ফলে দেখা যাচ্ছে—৫৫ লাখ ৭৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে কেবল কোম্পানি ধরন অনুযায়ী সামান্য বৃদ্ধি করে। সেজন্য সরকারের উচিত হবে শিল্পকারখানায় বেশি করে বিনিয়োগ, সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া এবং শিল্প বিপ্লবের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

তিন

তা ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি যে সকল সংস্থায় শূন্যপদ রয়েছে, সেগুলোতে অতি দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান শূন্যপদের সংখ্যা খুব বেশি না থাকলেও সরকারি কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সচিবালয় থেকে শুরু করে পরিদপ্তর, অধিদপ্তর, সরকারি কলেজ এবং প্রাইমারি স্কুল, সরকারি হাই স্কুলগুলোতে অনেক শূন্যপদ রয়েছে। যদি যথাসময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের শূন্যপদ পূরণ করা হয়, আমার বিশ্বাস কমপক্ষে চার-পাঁচ লাখের বেশি হবে। সুতরাং এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীকে কেবল শূন্য পদগুলোতে যথাসময়ে নিয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

দিনদিন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শূন্যপদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে এখন ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৮৯৭টি পদশূন্য রয়েছে। এগুলো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির। শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে বিলম্বিত নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কর্মকর্তাদের উদ্যোগের অভাবকে দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা। এই সংখ্যাটি সরকারি চাকরির প্রায় ২৩.৮২ শতাংশ। যেখানে প্রায় ৪ লাখ শূন্যপদ রয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৭ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রথম শ্রেণির ৭৬৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৮৭৬, তৃতীয় শ্রেণির এক হাজার ৪৭২ ও চতুর্থ শ্রেণির ৮৫৪টি পদ খালি। অধিদপ্তর ও বিভাগে প্রথম শ্রেণির ২৬ হাজার ৫৩৮, দ্বিতীয় শ্রেণির ৩৪

হাজার ৯৯২, তৃতীয় শ্রেণির এক লাখ ৫১ হাজার ২৪২, চতুর্থ শ্রেণির ৪৫ হাজার ৫১৬টি পদ খালি।

বিভাগীয় কমিশনার, জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেদের (ভূমি) কার্যালয়ে প্রথম শ্রেণির ৬৭৮, দ্বিতীয় শ্রেণির ৪৮৯, তৃতীয় শ্রেণির ৫ হাজার ৬৮৯ এবং চতুর্থ শ্রেণির পদ ৪ হাজার ৫৩৪টি পদ শূন্য। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কর্পোরেশনে প্রথম শ্রেণির ২০ হাজার ৮১৩, দ্বিতীয় শ্রেণির ২৮ হাজার ৭২৬, তৃতীয় শ্রেণির ৪৮ হাজার ৩৫৭ এবং চতুর্থ শ্রেণির ২৮ হাজার ৩৫৭ পদ খালি।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ সালে সরকারি চাকরিতে শূন্যপদ ছিল দুই লাখ ৭৬ হাজার ৫৮৭। পরের বছর এ সংখ্যা দাঁড়ায় তিন লাখ ২ হাজার ৯০৪। ২০১৫ সালে তিন লাখ ২৮ হাজার ৩১১ এবং পরের বছর তিন লাখ ৫৯ হাজার ২৬১ পদ খালি ছিল। সর্বশেষ ২০১৭ সালে শূন্যপদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৯৯ হাজার ৮৯৭টিতে। সরকার অনুমোদিত ১৬ লাখ ৭৮ হাজার ৩৪২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১২ লাখ ৭৮ হাজার ৪৪৬ জন কর্মরত আছেন, যার ২৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ নারী। সে হিসেবে দাঁড়ায় তিন লাখ ৪৪ হাজার ৪১৩ জন। নারী কর্মচারীদের ২৩ হাজার ৬৩৭ জন প্রথম শ্রেণির, ৫৩ হাজার ৪১ জন দ্বিতীয় শ্রেণির, দুই লাখ ৪৬ হাজার ৮১২ জন তৃতীয় শ্রেণির এবং ৪৭ হাজার ৯১ জন চতুর্থ শ্রেণির।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গ্রেড-১ এবং গ্রেড-২-এর কর্মচারীদের নিয়োগ দেয় যখন মন্ত্রীরা সরাসরি গ্রেড-২ এবং গ্রেড-৪ কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়। জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শূন্যপদ সবচেয়ে বেশি—৫১ হাজার ১২২টি। দ্বিতীয় স্থানে আছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেখানে ৪৩ হাজার ৯৮৩টি পদ খালি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ৪০ হাজার ৭৩৪টি, অর্থ মন্ত্রণালয়ে ২৫ হাজার ২৪৯, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৬ হাজার ২৯৪ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১৩ হাজার ১১২টি পদ খালি।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ৫০ হাজার ৪৬৬টি, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৭ হাজার ৯৪৭, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ২৯২, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে ৭ হাজার ৬৩৮, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৩০৫, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ হাজার ২৯২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ৯০৭, সংসদ সচিবালয়ে ৫৬১, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৩ হাজার ৭৫৮, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৯৫৩, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩ হাজার ৬৯২, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ৪ হাজার ৯৬৫, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঁচটি, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৬৫২, শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৬২টি, তথ্য মন্ত্রণালয়ে ২ হাজার ২৭৯, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ৭০৬, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৭৮৭, ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৪ হাজার ৪০, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৯৪৯, স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে ৩ হাজার ৮২৬, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ৭ হাজার ৫০৯, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২ হাজার ১৩৮, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৯১৩, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে ৩৩৬, প্রধানমন্ত্রীর

কার্যালয়ে ৪৭৫, ধর্ম মন্ত্রণালয়ে ৯, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ৮, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ১০২, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৬১৭, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৩১৭টি পদ খালি। পরিশেষে যদি সরকার শূন্যপদগুলো যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান করেন, তাহলে কমপক্ষে ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। আর যদি ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে আরও ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬৬৮ জন নতুন নিয়োগ দেওয়া সম্ভব। যা অতি সহজেই প্রায় ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৬৬৮ জনের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

চার

কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত আছেন দুই কোটি ৪৭ লাখ

মোট পরিবার/খানা : ২,৮৬,৯৫,৭৬৩ (কৃষিশুমারি ২০০৮)

মোট কৃষি পরিবার/খানা : ১,৫১,৮৩,১৮৩

কৃষিবহির্ভূত পরিবার/খানা : ১,৩৫,১২,৫৮০ মোট আবাদযোগ্য জমি : ৮৫.৭৭ লক্ষ হেক্টর

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষ-গ্রন্থ ২০১৭, বিবিএস

মোট সেচকৃত জমি : ৭৪.৪৮ লক্ষ হেক্টর; আবাদযোগ্য পতিত : ২.২৩ লক্ষ হেক্টর; ফসলের নিবিড়তা : ১৯৪%

এক ফসলি জমি : ২২.৫৩ লক্ষ হেক্টর

দুই ফসলি জমি : ৩৯.১৪ লক্ষ হেক্টর

তিন ফসলি জমি : ১৭.৬৩ লক্ষ হেক্টর

চার ফসলি জমি : ০.১৭ লক্ষ হেক্টর

নিট ফসলি জমি : ৭৯.৪৭ লক্ষ হেক্টর

মোট ফসলি জমি : ১৫৪.৩৮ লক্ষ হেক্টর

জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান : ১৪.১০ (স্থির মূল্যে) ২০১৭-১৮, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭, বিবিএসজিডিপিতে শস্য খাতের অবদান : ৭.৩৭ (স্থির মূল্যে) ২০১৭-১৮, কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি : ৪০.৬

কৃষি খাতকে আমরা মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি—

এক. আবাদি ও ফসলের জমি

দুই. মৎস্য সম্পদ

তিন. প্রাণিসম্পদ।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে পরিমাণ আবাদি জমি রয়েছে, তা আমরা সম্পূর্ণ এবং যথাযথভাবে ফসল করতে পারছি না। এখানে এক ফসলি, দুই ফসলি, তিন ফসলি ও চার ফসলি জমি রয়েছে। আবাদি জমি ও অনাবাদি জমিগুলোকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করা সম্ভব হলে ৫০ শতাংশ উৎপাদন এবং সাথে সাথে ৫০ শতাংশ কর্মক্ষেত্রও বৃদ্ধি সম্ভব। সেক্ষেত্রে বর্তমানে কর্মরত আছেন দুই কোটি ৪৭ লাখ। তাহলে ৫০ শতাংশ জনবল বৃদ্ধি হলে আরও এক কোটি ২৩ লাখ ৫০০ জন কৃষিক্ষেত্রে নতুনভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

আমাদের প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভর। বাংলাদেশ কৃষি থেকে প্রায় ৪৫ শতাংশ জিডিপি যুক্ত হয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে। আমরা যদি সুশিক্ষিত জনবল, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষি খাতকে সমৃদ্ধ করি, তাহলে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে আমরা খাদ্য মজুদ করে বিদেশেও রপ্তানি করতে সক্ষম হব।

আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিত কিন্তু বেকার, তাদেরকে কৃষিবিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ফিল্ড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিতে পারি। সরকারি অথবা বেসরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। অর্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত কৃষকগণ তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনাবাদি জমিগুলো আবাদি হবে।

আমাদের পুকুরগুলো সংস্কারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। এ ছাড়া বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং ও আরএসএস পদ্ধতিতেও মাছ চাষ সম্ভব। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষের ধরন ও পদ্ধতি বৃদ্ধি করতে পারি। আমাদের পশু সম্পদ যেমন : গবাদিপশু, ছাগল, ভেড়া মহিষসহ বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস-মুরগি পালনে নানা রকমের ছোটো বড়ো ও মাঝারি আকারের ফার্ম করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তায় শক্তিশালী করতে পারি। আশা করা যায়, উপরিউক্ত খাতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বেকারত্ব ৫০ শতাংশ হ্রাস হবে।

তিন-চতুর্থাংশ মানুষ সরাসরি কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। এ তিন-চতুর্থাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা চলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে। বাংলাদেশে বর্তমানে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, আবাসন প্রকল্প এবং নগরায়ণের ফলে ক্রমে কমছে কৃষি জমির পরিমাণ। নির্মাণ করা হচ্ছে রাস্তা, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার দোকানসহ বিভিন্ন রকমের স্থাপনা। এদিকে জলাধার, বন, পাহাড় রক্ষায় আইন ও নীতিমালা থাকলেও সরকারের মনিটরিংয়ের অভাবে এর তোয়াক্কা করছেন না কেউ। দ্রুত ভূমি রক্ষায় সমন্বিত নীতিমালা গ্রহণ না করলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে কৃষি মন্ত্রণালয় বলছে, মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে হলে শিল্পের বিপ্লব ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে

কৃষি জমিতে কিছুটা প্রভাব পড়বে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে এই প্রভাব মোকাবিলার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার।

বাংলাদেশের প্রায় ১৬ কোটি ৫৭ লাখ মানুষের জন্য চাষযোগ্য জমি রয়েছে মাত্র ৮৫ লাখ ৭৭ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশই হুমকির মুখে। বাণিজ্যিক কারণে দেশে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার ৯৬ বিঘা কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। রূপান্তরিত জমির পুরোটাই ব্যবহৃত হচ্ছে অকৃষি খাতে। জলাশয় ভরাট করে প্রতিদিন মোট কৃষি জমি কমছে ৯৬ বিঘা। পাশাপাশি তামাক চাষের কারণে প্রতিদিন ৯ হাজার একর কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। এভাবে কৃষি জমি কমতে থাকলে দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা চরম হুমকির সম্মুখীন হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ১১ বছরে মোট ২৬ লাখ ৫৫ হাজার ৭৩১ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে গেছে। অথচ এ দেশের মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৭ লাখ ৬৩ হাজার একর। বিভিন্ন গবেষণার তথ্যানুযায়ী দেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ বাড়ছে। আর প্রতিবছরে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে এক হাজার হেক্টর জমি।

পরিসংখ্যান বলছে, মোট ৮ দশমিক ৫২ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমি আছে। এ জমিতেই দেশের কৃষকরা কৃষিপণ্য উৎপাদন করে থাকেন এবং দেশের মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয় এ জমিতে উৎপাদিত খাদ্যশস্য দ্বারা। প্রতিবছর দেশের ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর চাষা-যোগ্য জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৯ দশমিক ৭৬২ মিলিয়ন হেক্টর। গত ৪০ বছরে এ জমির পরিমাণ কমেছে ১ দশমিক ২৪২ মিলিয়ন হেক্টর। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের জন্য কৃষি জমি অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। এভাবে কৃষি জমি কমতে থাকলে দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা চরম হুমকির সম্মুখীন হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৩টি। তাদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক। এসআরডিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিভাগভিত্তিক অকৃষি খাতে জমি চলে যাওয়ার প্রবণতা চট্টগ্রাম বিভাগে বেশি। এ বিভাগে প্রতিবছর ১৭ হাজার ৯৬৮ হেক্টর জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। রাজশাহী বিভাগে ১৫ হাজার ৯৪৫ হেক্টর, ঢাকায় ১৫ হাজার ১৩১ হেক্টর, খুলনায় ১১ হাজার ৯৬ হেক্টর, রংপুরে ৮ হাজার ৭৮১ হেক্টর, বরিশালে ৬ হাজার ৬৬১ হেক্টর জমি প্রতিবছর অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে।

কৃষি জমি সুরক্ষা আইনের খসড়া : প্রস্তাবিত কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, কৃষি জমিতে আবাসন, শিল্পকারখানা, ইট ভাঁটা বা অন্য কোনো রকম অকৃষি স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। জমি যে ধরনেরই হোক না কেন, তা কৃষি জমি হিসেবেই ব্যবহার করতে হবে। দেশের যেকোনো স্থানের কৃষি জমি এ আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হবে এবং

কোনোভাবেই তা ব্যবহারে পরিবর্তন আনা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই উর্বর জমিতে স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করতে হবে। যেকোনো ধরনের জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না। আইনে বিচার ও দণ্ড হিসেবে বলা হয়েছে, আইন লঙ্ঘনকারী বা সহায়তাকারীর অনূর্ধ্ব দুই বছর কারাদণ্ড বা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ আইনের অধীনে অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপসযোগ্য হবে এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা কিংবা বন ও মৎস্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মামলা করতে পারবেন।

নদীভাঙন : প্রতিবছর নদীভাঙনে এক হাজার হেক্টর ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। ঘরছাড়া হচ্ছে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। এমনটি চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৫৭৫ বর্গকিলোমিটার ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হবে, যার অর্ধেকেরও বেশি থাকবে কৃষি জমি। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসের (সিইজিআইএস) হিসাব অনুসারে, ২০১০ সালে ১ হাজার ৬৫৫ হেক্টর জমি ভাঙনের শিকার হয়। ২০০৯ ও ২০০৭ সালে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ১৭৮ ও ২ হাজার ৭৬৬ হেক্টর।

নতুন নতুন ইট ভাঁটা : নগরায়ণের কারণে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে ইটের ভাঁটা। রাজধানীসহ সারা দেশে পরিকল্পনাহীনভাবে ইট ভাঁটা গড়ে উঠছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসাবে দেশে ইটখোলা আছে ৪ হাজার ৫১০। এগুলোয় প্রতিবছর পোড়ানো হয় অন্তত তিন হাজার ২৪০ কোটি ইট। ইট-প্রতি মাটির পরিমাণ গড়ে তিন কেজি ধরলেও সাড়ে ১৩ কোটি টন মাটি লাগে, যে কারণে বছরে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমি (দুই ফুট গভীর পর্যন্ত মাটি কাটা ফলে) ফসল উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষিবিদ ও মৃত্তিকা গবেষকরা বলেছেন, ছয় হাজার ইটখোলার দখলে রয়েছে (প্রতিটি গড়ে সোয়া আট একর) প্রায় ৫০ হাজার একর আবাদি জমি।

অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা : বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার রাজধানী পার্শ্ববর্তী হওয়ায় যত্রতত্র গড়ে উঠছে আবাসন প্রকল্পসহ শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পে কৃষি জমি গ্রাস করায় এ এলাকায় দ্রুত কমছে আবাদযোগ্য জমি। নতুন আবাসন এলাকাগুলো আবাসনের উপযোগী করে তোলার জন্য মাটি ভরাট করতে হয়। পরবর্তী সময়ে এ জমিগুলো আর চাষাবাদের যোগ্য থাকে না। সরেজমিন দেখা গেছে, ঢাকা-ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশের কৃষি জমি শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে অকৃষিতে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া ঢাকা-গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী-মুন্সীগঞ্জ-মানিকগঞ্জসহ আশপাশের জেলাগুলোতে দ্রুত কৃষি জমি কমছে। আগামী পাঁচ বছর পর ঢাকার আশপাশে কৃষি জমি কিংবা কোনো জলাশয় থাকবে কি না, এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজধানীর গ্রাম হিসেবে একসময় পরিচিত ছিল ডেমরার কোনোপাড়া, পাড়াডগার, সারুলিয়া, শনিরআখড়া, মাণ্ডা, মুগদা, পূর্ব রাজারবাগ, মিরপুরসহ

বেশ কিছু এলাকা। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে এখন এসব এলাকায় গড়ে উঠেছে শিল্প প্রতিষ্ঠান।

পাঁচ

ওভার টাইম স্প্রডিং মেথড : যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ওভারটাইম সিস্টেম রয়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরগুলো এবং পাওয়ার প্লান্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো বেশির ভাগই ২৪ ঘণ্টা কার্যক্রম চালায়। সেক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা তিন শিফটের জায়গায় দুই শিফট করেন। যেখানে সাধারণত ৮ ঘণ্টা করে প্রত্যেকটা শিফট থাকে, সেখানে একই শ্রমিককে চার ঘণ্টা ওভারটাইম দিয়ে দুই শিফটে ২৪ ঘণ্টা প্রোডাকশন চালিয়ে নেন।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করলে কর্মরত চাকরিজীবীর পরিমাণ হবে কমপক্ষে এক কোটি ৫০ লাখ। এই ধরনের দুই শিফটের কোম্পানিগুলোকে যদি তিন শিফট করি অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা করে ডিউটি করি, তাহলে ২৪ ঘণ্টা করতে ৩ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। সুতরাং এই পলিসি প্রয়োগ করলে এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। অর্থাৎ আরও ৫০ লাখ নতুন জনবল নিয়োগ দেওয়া সম্ভব। এখানে দুজন কর্মী ৮ ঘণ্টা বেসিক ডিউটি করে পায় ১০ হাজার ও ওভার টাইম ৪ ঘণ্টাসহ মোট ৩০ হাজার বা কিছু বেশি। মালিকের ২৪ ঘণ্টার জন্য মোট খরচ ৩০ হাজার। অন্যথায় ১০ হাজার টাকা বেসিকে তিন জন ৮ ঘণ্টা ডিউটি করে পায় ৩০ হাজার টাকা। এখানে মালিকের আর্থিক তেমন কোনো লোকসান হচ্ছে না। শুধু শ্রমিকের কিছু অসুবিধা হচ্ছে যে, ওভার টাইম পাচ্ছে না। কিন্তু সুবিধা হলো—আরেকটি পরিবারের মুখে অন্ন জোগান দিচ্ছে। মালিক ও শ্রমিক উভয়ের সমঝোতার ভিত্তিতে কিন্তু আরেকটি পরিবারের খাবারের জোগান সৃষ্টি হচ্ছে।

তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে মালিকপক্ষকে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যেমন : মালিকরা শ্রমিকদের বেসিক বেতন কাঠামো রিভিউ করে কিছু পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি করতে পারেন, যাতে তাদের ফ্যামিলিগুলো খুব সুন্দরভাবে চলতে পারে। আর যারা এক্সিস্টিং শ্রমিক রয়েছেন, তাদেরও একটু বড়ো মনের পরিচয় দিতে হবে—অন্তত পক্ষে আমি একটু কষ্ট করে চললেও আমার আরেকজন ভাই, আরেকজন অভাবী চাকরি পাচ্ছে এবং তার ফ্যামিলি নিয়ে আমাদের মতোই স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। আশা করি এই মালিক-শ্রমিক সমঝোতার ভিত্তিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হবে। এই সমঝোতা এবং প্রণোদনা সিস্টেমকে চালু করলে প্রত্যেকটা কোম্পানিতেই প্রোডাকশন ও ইফোর্ট বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আগে দুজন কর্মী যে পরিমাণ কাজ করতেন, তার চাইতেও কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কাজ বেশি হবে। যেমন : যদি দুজনে ১০০ পিস প্রোডাকশন দিতে পারতেন, তাহলে এখন তিনজনে কমপক্ষে ১১৫ পিস প্রোডাকশন দিতে

সক্ষম। কিন্তু বেতন ও ঘণ্টা সমান; পক্ষান্তরে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হবে, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশ এত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকতে এত বেকার কেন? কেন মানুষ শিক্ষিত হলেই এসি রুমে চাকরি করতে হবে মনে করে? কেন মানুষ মনে করে না, শিক্ষিত হলেও খেত-খামারে কাজ করা যায়। কেন মানুষের মধ্যে এত দ্বিধা? কেন এত মতপার্থক্য? কেন মানুষ বুঝতে চেষ্টা করে না, বাংলাদেশে এত প্রাকৃতিক সম্পদ ও আবাদি জমি থাকতেও আমরা কেন বেকার? আমরা কেন আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও আবাদি জমিকে বেকারত্ব দূরীকরণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করি না? কী সমস্যা আমাদের? ঠিকই তো দেশের বাইরে এসে কনস্ট্রাকশনের কাজ, মরুভূমিতে মেষ আর ছাগল চরাতে দ্বিধা করি না। আমরা ভুলেই গিয়েছি, কৃষি একটি শিল্প। কাউকে খ্যাত বলার আগে একটু চিন্তা করা উচিত। এই খ্যাতই কিন্তু আমাদের ভাগ্য উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরিউক্ত পরিকল্পনাগুলো যে সকল মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে—

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়